বিজিত ঘোষ সম্পাদিত

নানা রূপে সত্যজিৎ

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

পরিচালক সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায়ের ছোট ছবি : নবীনানন্দ সেন ৩১
সত্যজিৎ রায় : একজন সমাজ-সচেতন শিল্পী : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ৩৮
রবীন্দ্র-সত্যজিতের যুগলবন্দী : পল্লব সেনগুপ্ত ৪৩
সত্যজিৎ রায় : ফিল্ম-টেক্সট ও একজন পাঠক : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১
চিত্রনাট্য রচনায় সত্যজিৎ : অনিল চট্টোপাধ্যায় ৫৯
অভিনয়-শিক্ষাদানে সত্যজিৎ রায় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৬৫
সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে শিশুরা : শুভাশিস ঘোষ ৬৯
সত্যজিতের কয়েকটি ছবির টুকিটাকি : কিছু নিজস্ব অভিমত : স্বনির্ভর শীল ৭৩
'ঘরে-বাইরে' : উপন্যাস ও চলচ্চিত্র : বিজিত ঘোষ ৭৯

সঙ্গীত-ভাবনায় সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায়ের আবহসঙ্গীত : গৌতম ঘোষ ৯৫
সত্যজিতের রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভাবনা : সুভাষ চৌধুরী ১০০
রেকর্ড-সংগ্রাহক সত্যজিৎ রায় : কিশোর চট্টোপাধ্যায় ১০৭

চলচ্চিত্র-ভাবনায় সত্যজিৎ

সত্যজিতের চলচ্চিত্রচিন্তা : তিনখানি বই/আলোচনা : দেবীপদ ভট্টাচার্য ১১৩

লেখক সত্যজিৎ

এ, বি, সি, ডি : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১
তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ : এক ভক্ত পাঠকের চোখে :
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ১৩০
বড়দের গল্প না কি একালের গল্প : অলোক রায় ১৩৬
প্রাপ্তবয়স্কের জন্য লেখা দু'টি গল্প : ধ্রুব গুপ্ত ১৪১
বাস্তবে মুক্তি, অবাস্তবের বাস্তবতা : সত্যজিতের গল্প : ক্ষেত্র গুপ্ত ১৪৭
সত্যজিৎ রায়ের গল্পের গদ্য : বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৫৫
লাল খাতা, বহুরূপী কালি, ডেঁয়ো পিঁপড়ে এবং ইত্যাদি :
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬১
রূপকথা-শিল্পী সত্যজিৎ : অভিরূপ মিত্র ১৬৮
সত্যজিৎ : ভূতের গল্প : গল্পের ভূত : মানস মজুমদার ১৭১

অঙ্কন-শিল্পে সত্যজিৎ

প্রচ্ছদ-শিল্পী সত্যজিৎ রায় : সন্দীপ সরকার ১৭৯
মুদ্রণ সাধনায় সত্যজিৎ রায় : দীপঙ্কর সেন ১৮৫
অলঙ্করণে সত্যজিৎ : সুধীর মৈত্র ১৮৯
গ্রন্থ-চিত্রক সত্যজিৎ রায় : বাদল বসু ১৯৫

সম্পাদক সত্যজিৎ

সন্দেশ সম্পাদক সত্যজিৎ রায় : নলিনী দাশ ২০১

অনুবাদক সত্যজিৎ

অনুবাদ-সাহিত্য : সত্যজিৎ রায় : স্বরাজ সেনগুপ্ত ২০৯

আলোকচিত্র

২১৫

তথ্যপঞ্জিতে সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায় : পত্রিকা পঞ্জি : সন্দীপ দত্ত ২৪৯

সত্যজিৎ রায় : কীর্তি-তালিকা

চলচ্চিত্র পঞ্জি : কাহিনী চিত্র : দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ২৮১
সংক্ষিপ্ত লেখক-পরিচিতি ৩০৭

ভূমিকা

সত্যজিৎ চলচ্চিত্র-পরিচালক হিসেবে বিশ্ববরেণ্য। এই শিল্প-মাধ্যমটিতে তাঁর সিদ্ধি গগনচুম্বী। কিন্তু চলচ্চিত্র-নির্মাণ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার অনন্যতা বিস্ময়কর। কথাসাহিত্য-রচনায়, সঙ্গীত-সৃষ্টিতে, অঙ্কনে ও অলংকরণে, সম্পাদনায়, অনুবাদে, চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত গ্রন্থ-রচনায়; প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার দ্যুতি পরিস্ফুট। সত্যজিৎ-প্রতিভার এই সামগ্রিক দিকের প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে। চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার।

ব্যক্তি ও স্রষ্টা সত্যজিৎকে সমগ্রভাবে দেখার জন্য, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়নের চেষ্টায় আমি প্রথমেই গ্রন্থটিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি। (১) পরিচালক সত্যজিৎ (২) সঙ্গীত-ভাবনায় সত্যজিৎ (৩) চলচ্চিত্র-ভাবনায় সত্যজিৎ (৪) লেখক সত্যজিৎ (৫) অঙ্কন-শিল্পে সত্যজিৎ (৬) সম্পাদক সত্যজিৎ (৭) অনুবাদক সত্যজিৎ (৮) তথ্যপঞ্জিতে সত্যজিৎ (৯) সত্যজিতের কীর্তিতালিকা।

২

"পরিচালক সত্যজিৎ" পরিচ্ছেদে সত্যজিতের কয়েকটি 'ছোট ছবি'-র আলোচনা করেছেন নবীনানন্দ সেন। সত্যজিৎ সর্বমোট আটটি 'ছোট ছবি' করেছেন। তার মধ্যে তথ্যচিত্র পাঁচটি,—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯৬১ ; ৫৪ মিনিট), 'সিকিম' (১৯৭১), 'দি ইনার আই' (১৯৭২ ; ২০ মিনিট), 'বালা' (১৯৭৬ ; ৩৩ মিনিট) এবং 'সুকুমার রায়' (১৯৮৭ ; ৩০ মিনিট)। আর স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনী চিত্র তিনটি —'টু' (১৯৬৪), 'পিকু' (১৯৮০) ও 'সদগতি' (১৯৮১)বলা বাহুল্য এগুলি নামেই 'ছোট ছবি'। কিন্তু বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তিতে ও সামাজিক অভিঘাতের নিরিখে এগুলির আভ্যন্তরিক গভীরতা বিস্ময়কর।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সত্যজিৎকে একজন সমাজ-সচেতন শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সত্যজিতের 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিতা', 'অপুর সংসার', 'জলসাঘর', 'দেবী', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ', 'জনঅরণ্য', 'মহানগর', 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী', 'সদগতি' প্রভৃতি বিশিষ্ট চলচ্চিত্রগুলিকে অবলম্বন করে।

রবীন্দ্রনাথের চারটি গল্প ও একটি উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ তিনটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প ('পোস্টমাস্টার'—১২৯৮, 'সমাপ্তি'—১৩০০, 'মণিহারা'—১৩০৫) অবলম্বনে সত্যজিৎ করেন 'তিনকন্যা' (১৯৬১)। রবীন্দ্রনাথের বড়ো গল্প 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) অবলম্বনে 'চারুলতা' (১৯৬৪) নির্মিত হয়। এবং সবশেষে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' (১৯৬১) উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয় সত্যজিতের 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৫) ছবিটি।

মূল কাহিনীর গ্রহণ-বর্জন-সংযোজনের মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথকে স্বীকরণ করেই রবীন্দ্র-কাহিনীতে দিয়েছেন ভিন্ন মাত্রা। এ নিয়ে আলোচনা করেছেন পল্লব সেনগুপ্ত, 'রবীন্দ্র সত্যজিতের যুগলবন্দী' প্রবন্ধে।

আজকের 'রিয়্যাল-রীডার' যে ইতিহাসে সম্পৃক্ত তার মধ্যে কোন্ বিশেষ বার্তা বহন করে আনে সত্যজিতের ছবি? সত্যজিতের 'ফিল্ম-টেক্সট' নিয়ে আলোচনা করেছেন পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'সত্যজিৎ রায় : ফিল্ম-টেক্সট ও একজন পাঠক' প্রবন্ধে।

১৯৫৭ সালে 'ভারতকোষ' গ্রন্থে চিত্রনাট্য সম্পর্কে সত্যজিৎ লিখেছিলেন, '.... যে লিখিত নকশাটি অনুসরণ করিয়া একটি চলচ্চিত্র রচিত হয়, তাহাকে চিত্রনাট্য বলে। চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রের ভিত্তিস্বরূপ; সুতরাং চিত্রনাট্যের পরিকল্পনা হইতেই চিত্রনির্মাণ কার্যের শুরু। .... চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।' অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন : 'চিত্রনাট্য রচনায় সত্যজিৎ'।

অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন, সত্যজিৎ তাঁর কুশীলবদের দিয়ে শ্রেষ্ঠতম অভিনয়টা কিভাবে বার করে আনতেন। শিশু মনস্তত্ত্ব ব্যাপারটা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে তাকে অসামান্য দক্ষতায় চলচ্চিত্র-ভাষায় রূপ দিয়ে গেছেন সত্যজিৎ। এ-বিষয়টি আলোচিত হয়েছে শুভাশিস ঘোষের 'সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে শিশুরা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে।

সত্যজিতের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'ঘরে বাইরে', 'গণশত্রু', 'শাখাপ্রশাখা' আর 'আগন্তুক'-এর কিছু টুকরো দৃশ্য নিয়ে একান্ত নিজস্ব অনুভবের কথা শুনিয়েছেন স্বনির্ভর শীল। তাঁর রচনাটির শিরোনাম : 'সত্যজিতের কয়েকটি ছবির টুকিটাকি : কিছু নিজস্ব অভিমত।'

বিজিত ঘোষ সত্যজিতের বিতর্কিত ছবি 'ঘরে-বাইরে' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ 'ঘরে-বাইরে : উপন্যাস ও চলচ্চিত্র'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ "সংগীত ভাবনায় সত্যজিৎ"। এ-প্রসঙ্গে সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন : 'সত্যি কথা বলতে কী বড় দরের ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পীরা কেউই ফিল্মের কম্পোজার নন। .... এঁরা বাজনদার হিসেবে একেবারে প্রথম শ্রেণীর এবং অত্যন্ত উঁচুদরের, কিন্তু ফিল্ম কম্পোজাব হিসেবে এঁরা কেউই খুব একটা ওয়াকিবহাল বলে মনে হয়নি, তখনই সংগীত রচনার দায়িত্বটা নিজে নিলাম।' সত্যজিতের আবহসংগীতের বিশিষ্টতা, পরবর্তী প্রজন্মের চলচ্চিত্রকার ও আবহসংগীত রচয়িতাদের সত্যজিতের কাছ থেকে কি কি শিক্ষণীয়, এ-বিষয়ে লিখেছেন চলচ্চিত্র-পরিচালক গৌতম ঘোষ 'সত্যজিৎ রায়ের আবহসংগীত' প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে সত্যজিৎ নানা অসতর্ক মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এর কারণ সম্ভবতঃ সত্যজিৎ রবীন্দ্রসংগীতের সামগ্রিক চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। এ নিয়ে আলোচনা করেছেন সুভাষ চৌধুরী 'সত্যজিতের রবীন্দ্রসংগীত-ভাবনা' প্রবন্ধে।

কিশোর চট্টোপাধ্যায় সত্যজিৎ বিষয়ে এযাবৎকাল অনালোচিত একটি বিষয় নিয়ে লিখেছেন ঃ 'রেকর্ড-সংগ্রাহক সত্যজিৎ রায়'। পাশ্চাত্য সংগীতের ক্যাসেট সংগ্রহ করা ও শোনা সত্যজিতের দীর্ঘদিনের শখ। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'বাখ্ আর বিটোফেন, সাইবেলিয়াস আর মোৎসার্ট ছাড়া আমি-মানুষটার অস্তিত্বের কি অর্থ থাকতে পারে?'

গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ "চলচ্চিত্র-ভাবনায় সত্যজিৎ"। 'Our Films Their Films' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় সত্যজিৎ লিখেছেন ঃ 'ফিল্মকরিয়েরা ফিল্ম বিষয়ে বড় একটা লেখে না। হয় তারা যে ফিল্মটি তৈরি করছে তাই নিয়ে বড় ব্যস্ত থাকে, অথবা কোনো ফিল্ম করার সুযোগ না পাওয়ায় অসুখী থাকে অথবা ঠিক আগের ছবিটার কাজের ক্লান্তিতে ডুবে থাকে।' বলা বাহুল্য সত্যজিৎ এ-জাতীয় 'ফিল্মকরিয়ে' আদৌ নন। এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেবীপদ

ভট্টাচার্য সত্যজিতের চলচ্চিত্র-চিন্তা নিয়ে লেখা তিনখানি বইয়ের ('বিষয় চলচ্চিত্র'-১৯৭৬, 'Our Films Their-Films' ১৯৭৬ ও 'একেই বলে শুটিং'-১৯৭৯) আলোচনা করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ "লেখক সত্যজিৎ"। চল্লিশ বছর বয়সে কলম ধরেই সত্যজিৎ রায় আসর মাত করলেন। সত্যজিতের গল্পসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ১৯৮৩-র ডিসেম্বর সংখ্যা 'মহানগর'-এ (সমরেশ বসু সম্পাদিত) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম করেন। বাংলা গোয়েন্দা-গল্পের ধারায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আর এক উজ্জ্বল, ঝক্‌ঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনী উপহার দিলেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিতের গোয়েন্দা-গল্প 'ফেলুদা' বিষয়ে লিখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'এ, বি, সি, ডি'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফেলুদা-সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'বাদশাহী আংটি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯-এ।

ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনী ও প্রোফেসর শঙ্কুর কল্পবিজ্ঞান ছাড়াও ভিন্ন স্বাদের কিছু মজাদার গল্প পাওয়া যায় সত্যজিতের 'তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ' গল্প সংকলনে। এই গল্পগুলির অধিকাংশই অলৌকিক রসের। সত্যজিতের এই তারিণী খুড়ো বিষয়ক গল্পগুলিকে অবলম্বন করেই উজ্জ্বলকুমার মজুমদার লিখেছেন, 'তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ ঃ এক ভক্ত পাঠকের চোখে।'

সত্যজিৎ নিজেই 'পিকুর ডায়রি', 'পিকু' (চিত্রনাট্য), 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু', 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি', 'সবুজ মানুষ', 'শাখাপ্রশাখা' (চিত্রনাট্য)—এই রচনাগুলিকে 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' অভিধা দিয়েছেন। সত্যজিতের 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' লেখা এই রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন অলোক রায় ও ধ্রুব গুপ্ত যথাক্রমে 'বড়দের গল্প না কি একালের গল্প' ও 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা দু'টি গল্প' প্রবন্ধদ্বয়ে।

গোয়েন্দা-কাহিনী (ফেলুদা), কল্পবিজ্ঞান (প্রোফেসর শঙ্কু), অলৌকিক গল্প (তারিণী খুড়ো) 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' গল্পগুলির বাইরেও সত্যজিতের পাঁচটি গল্প-গ্রন্থে ('এক ডজন গপ্‌পো'-১৯৭০, 'আরো এক ডজন'-১৯৭৬, 'আরো বারো' ১৯৮১, 'এবারো বারো'-১৯৮৪, 'একের পিঠে দু'-১৯৮৮) আরো ৬০টি উল্লেখযোগ্য গল্প পাওয়া যায়। সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন ক্ষেত্র গুপ্ত, 'বাস্তবে মুক্তি, অবাস্তবের বাস্তবতা ঃ সত্যজিতের গল্প' প্রবন্ধে।

লেখক-সত্যজিতের গল্প-উপন্যাসের কাহিনীতে এক বিশেষ চমৎকারিত্ব তো থাকেই। এর পাশাপাশি থাকে আর একটি বড় দিক; তা হ'ল তাঁর বিশিষ্ট গদ্যনির্মাণ। দীর্ঘ, জটিল, ক্লান্তিকর, ফেনায়িত, নিরর্থক বাক্য ধারার পরিবর্তে, ছোট ছোট সরল বাক্য সত্যজিতের গদ্যশৈলীতে এক বিশেষ গতিবেগ ও নাটকীয়তা সৃষ্টি করে। তরল আবেগের পরিবর্তে তাঁর গদ্যে পাই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। ভাষাও মেদহীন। তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। যা যে কোনো বয়সের পাঠককে করে আকৃষ্ট। সত্যজিৎ রায়ের গদ্য ভাষার অনন্যতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'সত্যজিৎ রায়ের গল্পের গদ্য।'

১৯৬১-তে, চল্লিশ বছর বয়সে সত্যজিৎ প্রথম বাংলা গল্প লেখেন। সায়েন্স ফিকশন। প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ঃ 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি'। 'সন্দেশ'-এ। সত্যজিৎ রায়ের কল্পবিজ্ঞান-আশ্রয়ী 'প্রোফেসর শঙ্কু'-র উপর আলোচনা করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'লাল খাতা, বহুরূপী কালি, ডেঁয়ো পিঁপড়ে এবং ইত্যাদি'-তে। সত্যজিতের শঙ্কু সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'প্রোফেসর শঙ্কু' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। রূপকথার আপাত সরল আলেখ্যের অন্তরালে কত গভীর সব ছবি এঁকে গেছেন সত্যজিৎ, তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ 'সুজন হরবোলা'-র গল্পগুলিতে। সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন অভিরূপ মিত্র তাঁর 'রূপকথা শিল্পী সত্যজিৎ' প্রবন্ধে।

পরিচালক সত্যজিৎ

নবীনানন্দ সেন

সত্যজিৎ রায়ের ছোট ছবি

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকারদের অনেকেই ডকুমেন্টারি বা শর্ট ফিল্মের হাতে-খড়ি করে ফিচার ফিল্মের জগতে এসেছেন। বিদেশেও এমন নজির খুব কম নয়। সেদিক থেকে সত্যজিৎ রায় ব্যতিক্রম। ১৯৫৫ সালে পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচলি' দিয়ে আত্মপ্রকাশ। সে ছবিতেই হাতেখড়ি, সে ছবিতেই পরিপূর্ণতা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি। পরের পাঁচ বছরে আরো পাঁচটা ছবি করেছেন, সবই ফিচার; কখনো বোধ হয় ভাবেনও নি কোনো ডকুমেন্টারি ছবি করার কথা। ফিচার ফিল্মেই নানান বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন। আমরা পেয়েছি 'পরশ পাথর', 'জলসাঘর', 'দেবী'র মতো বিভিন্ন আদলের ছবি।

১৯৬১ সালে সত্যজিৎ বানালেন তাঁর প্রথম ডকুমেন্টারি ছবি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। কিন্তু তা নিজের গরজে ততটা নয়, যতটা সরকারি তাগিদে। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দু'বছর আগেই ভারত সরকার উপযাচক হয়ে এই ছবি তৈরি করার দায়িত্ব দেন তাঁকে। তৈরি হয় এক অসামান্য ছবি। তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের মোট ছত্রিশ বছরে আঠাশটি ফিচার ফিল্মের পাশাপাশি সত্যজিৎ ডকুমেন্টারি তৈরি করেছেন সাকুল্যে পাঁচটি, স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র করেছেন তিনটি। প্রায় সবকটিই ফরমায়েশী ছবি।[১]

বলা বাহুল্য, সত্যজিৎ রায় নিজেকে মূলত ডকুমেন্টারি বা স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবির পরিচালক হিসেবে কখনো ভাবেন নি। আর, এক 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বাদ দিলে তাঁর অন্যান্য ডকুমেন্টারি ছবিগুলি বিদেশে তো নয়ই, এদেশেও দেখানো হয়েছে কম ; দেখেছেন আরো কম মানুষ। কারণ এদেশে ডকুমেন্টারি ছবির প্রচার, প্রদর্শন, মদতদারি আজো নগণ্য, তাই তার জন্য সাধারণের আগ্রহ কম, কদরও কম। এবং সত্যজিৎ রায়ের কাহিনীচিত্র নিয়ে যে প্রচুর লেখালিখি হয়েছে দেশে-বিদেশে সে তুলনায় তাঁর ডকুমেন্টারি বা ছোটো ছবির আলোচনা নিতান্তই নগণ্য।

---

১. ১৯৬১ সালে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' করেছিলেন তদানীন্তন ভারত সরকারের তাগিদে, ফিল্মস্ ডিভিশন-এর প্রযোজনায়। ১৯৭১-এ 'সিকিম' করেছিলেন তদানীন্তন সিকিমের চোগিয়ালের অনুরোধে। ১৯৭২-এ 'দি ইনার আই'-ও ফিল্মস্ ডিভিশন-এর প্রস্তাবে ও প্রযোজনায় তৈরি হয়। ১৯৭৬-এ প্রখ্যাত ভরতনাট্যম নর্তকী বালা সরস্বতীকে নিয়ে 'বালা' তৈরি করেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব পারফরমিং আর্টস-এর উপরোধে। আর ১৯৮৭-তে 'সুকুমার রায়' তৈরি করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব অনুসারে।
এই ডকুমেন্টারি ছবিগুলি ছাড়া স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র 'ট' তৈরি করেন ১৯৬৪ সালে ইউ. এস. পাবলিক টেলিভিশন সার্ভিস্-এর প্রস্তাবে "এসো (ESSO) ওয়ার্ল্ড থিয়েটার" এর ব্যানারে ছোটো ছবির একটি 'ট্রিলজির' দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে। ১৯৮০-তে 'পিকু' তৈরি হয় এক ফরাসি টেলিভিশন কোম্পানীর ফরমায়েশে। আর পরের বছর ভারতীয় দূরদর্শনের প্রস্তাব মতো তাদের প্রযোজনায় করেন 'সদ্‌গতি'।

অথচ প্রকৃতপক্ষে এই উপেক্ষিত স্বল্পালোচিত ছবিগুলিও চলচ্চিত্রানুরাগীদের গভীর অভিনিবেশ দাবি করে; কারণ এগুলিতেও, তাঁর কাহিনী-চিত্রগুলির মতোই, প্রতিভার সে প্রয়োগের অনন্য স্বাক্ষর কম-বেশি ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলির কোনো কোনোটিতে বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন হয় বললে অত্যুক্তি হবে না। ভারতের তথ্যচিত্র এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এগুলির অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

১৯৬১ সালে যখন সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম ডকুমেন্টারি ছবি উপহার দিলেন তখন ভারতীয় ডকুমেন্টারি জগতে নিতান্তই মাঝারিপনা চলছে। ডকুমেন্টারি বলতে তখন বোঝায় সরকারি 'ফিল্মস্ ডিভিশন'-এর ছবি, আর সেসব ছবি তখন অবধি মূলত সরকারি বিভিন্ন পরিকল্পনার ও কর্মসূচির প্রচারমূলক 'নিউজ রীল', কখনো-সখনো ভারতে কোনো আঞ্চলিক সংস্কৃতির তথ্যবহুল ছোটো ছোটো ছবি; কিন্তু সেসব ছবির মধ্যে না ছিল কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণী গভীরতা, না ছিল কোনো নান্দনিক ট্রিটমেন্টের ছাপ।[২]

এই পটভূমিতে সত্যজিতের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' তাঁর 'পথের পাঁচালি'র মতোই তথ্যচিত্রের জগতে শিল্পসুষমার নতুন দিগন্ত সূচিত করলো এবং সাবালকত্বের ছোঁয়া এনে দিল। এ ছবি অবশ্য বহু প্রদর্শিত এবং মোটামুটি আলোচিত।

এখানে সীমিত পরিসরে আমরা খুবই স্বল্প প্রদর্শিত এবং স্বল্পালোচিত দুটি দু'ধরনের ছবি নিয়ে আলোচনা করব। একটি ডকুমেন্টারি — 'দি ইনার আই' (১৯৭৪), অন্যটি স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র — 'পিকু' (১৯৮১): শেষেরটি আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি ছোট্ট কাহিনীচিত্রের অবতারণা করব, সেটি হল 'টু' (১৯৬৪)। অর্থাৎ আড়াইখানা ছবির আলোচনা। এই সবকটি ছবির মধ্যেই একটা সাধারণ থীম — একাকীত্ব। আর প্রত্যেকটিতেই এক অনন্য "সত্যজিৎ-স্পর্শ" বিশেষভাবে অনুভব করা যায়।

শান্তিনিকেতনে আড়াই বছরের শিক্ষাপর্বে নন্দলাল বোস ছাড়া একমাত্র আরেকজন শিল্পগুরু তরুণ সত্যজিৎকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন: এই মানুষটি হলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। এঁকে নিয়েই সত্যজিৎ রায়ের তৃতীয় ডকুমেন্টারি ছবি 'দি ইনার আই' (ইতিপূর্বে '৭১ সালে করেছিলেন 'সিকিম' নামে একটি ডকুমেন্টারি ছবি)।

জন্ম থেকেই প্রায়ান্ধ বিনোদবিহারী ওই জীবনী-চিত্র তৈরির বছর পনেরো আগেই সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তবু তাঁর শিল্প-সৃষ্টি অব্যাহত থাকে। আমাদের দেশে এ ধরনের জীবনী-চিত্র আজও সাধারণত গুণকীর্তনমূলক বা ভাবালুতা-সর্বস্ব হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ বিস্ময়করভাবে ওইসব নিশ্চিত গাড্ডা পরিহার করেছেন। 'দি ইনার আই'তে আগাগোড়া একটা stoic মেজাজ টানটান করে ধরা আছে যা বিনোদবিহারীর ব্যক্তিজীবনের আচরণ ও আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। এ ছবির ট্রিট্‌মেন্টে সত্যজিতের স্বভাবসিদ্ধ সংযম ও পরিমিতিবোধ বিশেষভাবে লক্ষণীয় — ছবির দৃশ্যপট থেকে শুরু করে সঙ্গীতের ব্যবহার, এমন কী ধারাভাষ্য পর্যন্ত।

সকালবেলার একটি দৃশ্য দিয়ে ছবি শুরু। মিড্ ক্লোজ-আপ-এ ধরা দুটি হাত, মেঝেতে রাখা পরপর অনেক cut outs এর উপর দিয়ে আস্তে আস্তে সরে সরে যায়, এই হাই-অ্যাঙ্গল শট্-এর পর ক্যামেরা একটু সরে এলে দেখা যায় ওই দুটি এক শিল্পীর হাত, তাঁর এক-পাশ থেকে নেওয়া ঝুঁকে-পড়া profile দেখতে পাওয়া যায়। ঘুণাক্ষরেও অনুমান হয় না যে

২ বর্ষীয়ান ভারতীয় তথ্যচিত্র নির্মাতা বি. ডি. গর্গ এবং এন. ভি. কে. মূর্ত্তির লেখাতে এর সমর্থন মিলবে। দ্রষ্টব্য গ্রন্থ; জগমোহন (সম্পাদিত) "ডকুমেন্টারি ফিল্মস্ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান অ্যাওয়েকেনিং" পাবলিকেশনস্ ডিভিশন, গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯৯০।

এ-শিল্পী সম্পূর্ণ অন্ধ; অবলীলাক্রমে তিনি করে যান এক মিউর‍্যালের পরিকল্পনা। খানিক পরে শিল্পীর জীবনপঞ্জীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিতে গিয়ে ভাবাবেগ-নিয়ন্ত্রিত ধারাভাষ্যে নিছক উল্লেখ থাকে তাঁর অন্ধত্বের বিবর্তনের।

খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে এ ছবিতে 'হাত' ঘুরে ফিরে বার বার আসে মোটিফের মতো। সত্যজিতের সঙ্গে কথোপকথনে বিনোদবিহারী অন্ধত্বের অনুভূতি সম্বন্ধে বলেছিলেন, "Space -টা হয়ে যায় একটা ঘন বস্তু — যেটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে সামনে এগোতে হয়। যে জিনিসটা স্পর্শ করছি সেটা ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্বই থাকে না।" Space সম্পর্কে এই 'নতুন চেতনা' সত্যজিৎ তুলে ধরেন একটি ছোট্ট কিন্তু অসামান্য দৃশ্যে। বিনোদবিহারীর শিল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন দেখাতে দেখাতে একসময় ক্যামেরা কিছুক্ষণ অনুসরণ করে শিল্পীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি প্রহর। 'দুপুরটা তাঁর বিশ্রামের সময়। এই সময়টা তিনি তাঁর বৈঠকখানায় বেতের চেয়ারে বসেন। চোখে কালো চশমা, সামনে বেতের টেবিলের উপর তাঁর সিগারেট, দেশলাই ও ছাইদান।' ক্যামেরা ঈষৎ নেমে এলে হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করি মেঝেতে দু'পায়ের মাঝে একটি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে কাৎ করে রাখা ফ্লাস্কে ভরা raw tea । সত্যজিতের সঙ্গে কথোপকথনের ফাঁকে হঠাৎ 'বিনোদ-দা' ঈষৎ অনিশ্চিত হাত নামিয়ে দিয়ে ফ্লাস্ক তুলে আনেন সাবলীলভাবে, তারপর তা খুলে চা ঢেলে নিয়ে চুমুক দেন। সত্যজিতের ঋজুকণ্ঠের ধারাভাষ্য বিনোদবিহারীর এই ছোট্ট নেশার কথা চকিতে একবার উল্লেখ করে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। এই এক মুহূর্তের ডিটেল অন্ধত্বে-অভ্যস্ত হয়ে-ওঠা এক নতুন অনুভূতি ছুঁয়ে গিয়ে এক খোশমেজাজের আমেজ সৃষ্টি করে, অন্ধত্বের handicap-কে গৌণ করে দেয়। শেষের দিকে একটি সিকোয়েন্সে 'হাত' ফিরে আসে আরো দৃঢ়তায়। আঁকার টেবিলে কাগজ পেতে দু'হাত বুলিয়ে তার মাপজোক বুঝে নেন বিনোদবিহারী। Flowmaster কলমে ঘচ্‌ঘচ্‌ করে সুদক্ষ smart strokes -এ একের পর এক বলিষ্ঠ স্কেচ্‌ — চারপাশে দেখা জীব-জন্তু, নারী-পুরুষ, ফুল ইত্যাদির। সে দৃশ্য অনবদ্য, অনির্বচনীয়। এমনই আরেক অসাধারণ মুহূর্ত আসে যখন সত্যজিৎ বিনোদবিহারীর পূর্ণ অন্ধত্বের কথা ধারাভাষ্যে প্রথম উল্লেখ করেন এবং পর্দায় তা তুলে ধরেন শিল্পীর কালো চশমার একটি কাঁচকে zoom out করে গোটা ফিল্ম ফ্রেমটা কালো করে দিয়ে এবং একমুহূর্ত তা 'ফ্রীজ' করে রেখে।

ছবিতে অন্ধত্বের প্রসঙ্গকে করুণা, সহানুভূতি বা ভাবাবেগে আপ্লুত না করে বিনোদবিহারীর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাকে এক নতুনতর উপলব্ধির স্তরে নিয়ে গিয়ে সত্যজিৎ ছবির সমাপ্তি করেছেন। শেষ শটে দেখা যায় বিনোদবিহারীর মুখের একটা সামনাসামনি ক্লোজ-আপ্‌ 'ফ্রীজ' করে দিয়ে তাঁরই একটা উদ্ধৃতি পর্দার একপাশে ভেসে ওঠে : 'Blindness is a new Feeling, a new experience, a new state of being', নেপথ্যে তখন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে রিন্‌রিন্‌ করে বেজে উঠেছে প্রভাতী আশার রাগিনী 'আশাবরী'। আর ছবি ততক্ষণে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে একটা Sublime দার্শনিক গভীরতায়।

এরই মধ্যে কিন্তু ভারতীয় চিত্র-শিল্পে বিনোদবিহারীর স্থান, তাঁর চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য সমস্ত বর্ণিত হয়েছে, আর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাঁর এককত্ব তথা একাকীত্বের একটা

৩. দ্রষ্টব্য সত্যজিৎ রায়ের 'বিষয় চলচ্চিত্র' (আনন্দ প্রকাশন, ১৯৮২) -তে অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ 'বিনোদদা'। শেষ অনুচ্ছেদে সত্যজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিনোদবিহারী বলছেন, "..... খোয়াই বাদ দিও না। খোয়াই আর তাতে একটি সলিটারি তালগাছ। ব্যাস। আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয়, ওতেই পাবে। বলতে পার —ওটাই আমি।"

ইম্প্রেশন — 'খোয়াই'-এর সলিটারি একটা তালগাছের মতন।' হয়তো বা সেজন্যেই বিনোদবিহারীর শিল্পীজীবনের সময়কাল ও বিবর্তন ধরতে গিয়ে এক নন্দলাল বোস ছাড়া আর কারুর নামোল্লেখও করেন নি সত্যজিৎ; যদিও সে-সময় রামকিঙ্কর, সোমনাথ হোড় প্রমুখ শিল্পীরা তাঁদের সৃজনশীলতার তুঙ্গে বিরাজ করছেন এবং সে সময় শান্তিনিকেতনে শিল্পীদের একটা পরিবারসুলভ পরিমণ্ডল ছিল, যদিও বিভিন্নজনের ছিল বিভিন্ন 'স্টাইল' (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সত্যজিতের অন্য জীবনী-চিত্রগুলিতেও মূলচরিত্রকে প্রায় এককভাবে, বড়োজোর তার পরিবারের পটভূমিতে তুলে ধরা হয়েছে, সমসাময়িক শিল্পীদের milieu -তে বা সামাজিক পরিমণ্ডলে তাকে দেখানো হয়নি। এটা সত্যজিতের individualist -আদর্শেরও প্রতিফলন হতে পারে)।

একাকীত্ব আরো অনেক স্পষ্ট করে সংবেদনশীলতায় সত্যজিৎ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'পিকু' চলচ্চিত্রে। ছাব্বিশ মিনিটের ছোট্ট ছবি 'পিকু' (১৯৮১)। মূলকাহিনী সত্যজিৎ রায়ের নিজেরই — কয়েক বছর আগে লেখা শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত দু-তিন পাতার একটা খুদে লেখা। অবশ্য 'চিত্রনাট্যের সঙ্গে মূলের যত না মিল তার চেয়ে বেমিল বেশি', সেকথা সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছেন। তাই সরাসরি ফিল্মের আলোচনায় আসা যাক।

স্কুলে-পড়া একটি ছোট্ট ছেলের জগৎ : তাদের বিরাট দালান, বাগান, তার বাবা, মা, দাদু, চাকর-বাকর আর জনৈক হিতেশ 'কাকু' (যে আসলে তার মার প্রণয়ী) এবং চারপাশের এই বড়োদের জগতের বিবিধ সম্পর্ক। অথচ এই পরিমণ্ডলে পিকু 'একলা', নিঃসঙ্গ (তার অন্তরঙ্গ বলতে একমাত্র তার দাদু, হার্টের রুগী, থাকেন বারান্দার যে-প্রান্তে পিকুদের ঘর সেদিকে নয়, 'অপর প্রান্তে')। বড়োদের জগতের নানারকম জটিলতার পটভূমিতে পিকুর একাকীত্ব — এই নিয়েই ছবি।

ছোটো ছোটো শট্, ছোটো ছোটো সংলাপের মধ্য দিয়ে এবং দৃশ্যপট (বা mis-enscene)-এর খুঁটিনাটি এবং সংলাপের nuances-এর মাধ্যমে একটু একটু করে সত্যজিৎ ফুটিয়ে তোলেন পিকুর জগৎ। পিকুর একাকীত্বের কথা কখনোই কেউ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেন না, কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে, অনুভূতিতে তা নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়।

যেমন, প্রথম দৃশ্যেই পিকুর মা-বাবার শোবার ঘরে পিকুর বিভিন্ন বয়সের চারটে ফ্রেমে বাঁধানো ছবির ওপর দিয়ে ক্যামেরা এগিয়ে গিয়ে পঞ্চম ফ্রেমে এক নারী-পুরুষের যুগল ছবির ওপর গিয়ে থামে; নিঃশব্দে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এটা একটা 'নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি' — স্বামী-স্ত্রী ও তাদের একমাত্র সন্তানের পরিবার (অবশ্য আরেকটু পরে আমরা জানতে পারি এই পরিবারের আরেক সদস্য পিকুর দাদুর কথা, কিন্তু তিনি কার্যত নন্-এন্টিটি)। বাড়ির একক শিশু-র ইঙ্গিতে একাকীত্বের প্রথম এবং প্রাথমিক আভাস।

ছবির প্রথম দৃশ্যে পিকুর বাবা-মা'র কথোপকথনের পর দ্বিতীয় দৃশ্যে নির্বাক কতগুলো শট পরপর সাজিয়ে পিকুর নিঃসঙ্গতা ফুটিয়ে তোলা হয়। পিকু গাড়িবারান্দার রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে — প্রথমে বাবা গাড়ি করে বেরিয়ে যান; তারপর টিং টিং শব্দ তুলে একটা রিকশা একজন ভীমবপু যাত্রীকে নিয়ে বাঁ থেকে ডাইনে চলে যায়; তারপর দশজন কুলির মাথায় একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো যায় ডাইনে থেকে বাঁয়ে; তারপর এক বিশাল সেন্ট বার্ণার্ড কুকুর সমেত এক ভদ্রলোক, তারপর একটা হালকা নীলরঙের রোলস রয়েস টুরার। অতঃপর পিকু দৃষ্টি ঘুরিয়ে পাশের বাড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে ওখান থেকেই একটি কুকুরের অবিরাম ঘেউ ঘেউ আওয়াজ আসছে এবং কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে

পিকু 'চোপ্' বলে পাল্টা আওয়াজ দিলে কুকুরের ডাক ম্যাজিকের মতো থেমে যায় (এই 'চোপ' কথাটাই পরে আবার ফিরে আসে তার মা আর হিতেশকাকুর রুদ্ধদ্বার প্রণয়ের দৃশ্যে, অনেক বেশি অভিঘাত নিয়ে, তাতে তখন যেন পিকুর অভিমান আর ক্ষোভ ধ্বনিত হয়)

এই সব টুকরো টুকরো দৃশ্য পরপর সাজিয়ে একটি কথাও না বলে স্কুল ছুটির দিনে পিকুর একলা অলস সকালের কয়েকটা মুহূর্তের মধ্য দিয়ে তার নিঃসঙ্গতার পরিচয় দেওয়া হয় (কারো কারো মনে পড়ে যেতে পারে 'চারুলতা' ছবিতে চারুর একাকীত্বের অনুরূপ দৃশ্যাবলী)।

আরেকটা দৃশ্যের কথা ধরা যাক। বারান্দায় রাখা টেলিফোনের পাশে একটা প্যাডে লেখা কিছু "জরুরি" ফোন নাম্বার থেকে পিকু পরপর কয়েকটা নাম্বার রিং করে। প্রথম জবাব আসে ঈভ্স বিউটি পার্লার থেকে, তার পরেরটা ট্রিংকা রেস্টোরান্ট থেকে, তারপর টেলিফোন ভবনের ট্রাংক বুকিং পোজিশন ডেস্ক থেকে। বিলাসবহুল বিউটি পার্লার, ব্যয়বহুল রেস্টোরান্ট বা দূরপাল্লার যোগাযোগ — কোনোটাই পিকুর নিজস্ব জগতের ব্যাপার নয়, এগুলো তার পক্ষে 'জরুরি'ও নয়, এ সবই তাই তার কাছে 'রং নাম্বার'। তাই অন্যপ্রান্ত থেকে "গুড্ আফটারনুন" শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই দুটি শব্দ উচ্চারণ করে সে বারে বারে ফোন নামিয়ে রাখে। এভাবে একটা আপাত মজার সিকোয়েন্সের মাধ্যমে সত্যজিৎ সৃষ্টি করেন এক গভীর 'irony' এবং বুঝিয়ে দেন পিকুর বাবা-মা'র 'জরুরি' পরিমণ্ডল থেকে তার alienation কতটা। বাড়ির ভেতর থেকে বড়োদের বাইরের জগৎকে সামনে নিয়ে আসেন তিনি এবং আভাসে ধরিয়ে দেন দুই জগতের সংঘাত।

কিংবা ধরা যাক, ফুলের কথা। ছবি জুড়ে 'ফুল' ফিরে ফিরে এসেছে মোটিফ্ হয়ে। হিতেশের কাছ থেকে ছবি আঁকার খাতা আর রঙিন ব্রাশ-পেন পেয়ে পিকু নতুন খাতায় প্রথমেই যে-ছবি এঁকে মাকে দেখায় তা হল দুটো ফুলের ছবি। তাতে তখনই কোনো অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। মা তাকে বাগানে গিয়ে সত্যিকারের ফুলের রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে ছবি আঁকার খেলায় মাতিয়ে নিজেদের থেকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। মায়ের কাছে ফুল হয়ে ওঠে একটা ছল, একটা ফিকির। এরপর সরলমন পিকু-র কাছে ফুলের রঙ মিলিয়ে ছবি আঁকাটা একটা জমজমাট খেলার মতো হয়ে দাঁড়ায়। এবার ফুলের রঙ আস্তে আস্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। আর গোটা ছবির mood এবং Complexionও আস্তে আস্তে পাল্টাতে থাকে। বাগানে অজস্র ফুলের গাছ থাকা সত্ত্বেও পিকুকে ফুল খুঁজে বেড়াতে হয় : 'এটা ফুলের সময় নয়।' হাই অ্যাঙ্গল শটে দেখা যায়, পিকু রঙ মিলিয়ে ছবি আঁকছে : প্রথমে উজ্জ্বল লাল পোর্টুলাকা, তারপর হলদে লানটানা, গোলাপি শাপ্লা, ...ফিকে লাল রঙের গোলাপ। একটু লক্ষ করলে আমাদের হুঁশ হয়, আপাতভাবে পরপর দেখা ফুলের রঙগুলো random মনে হলেও পরিচালক সেগুলোকে রেখেছেন এক বিশেষ ক্রমানুসারে — পিকুর দেখা (এবং আঁকা) ফুলের রঙ ক্রমাগত ফিকে হয়ে আসে। ইতিমধ্যে ইন্টারকাট করে দেখানো হয় পশ্চিম কোণে কালো মেঘ। তারপরই পিকুর চোখে পড়ে সাদা শাপলা, তারপর সাদা কাঠচাঁপা, সাদা গন্ধরাজ এবং আরো অনেক অনেক রকম সাদা ফুল। আর ঠিক তখনই দর্শককে চমকে দিয়ে এক নির্মম আয়রনির মুহূর্ত সৃষ্টি হয়। পিকু বাগান থেকে চিৎকার করে বলে "আমি সাদা ফুল কালো রঙ দিয়ে আঁকছি মা — সাদা রঙ নেই।" পিকু ওপর থেকে কোনো জবাব পায় না। কাট করে সীমা (পিকুর মা) আর তার প্রণয়ী হিতেশের একটা বেড্সীন সংক্ষিপ্তভাবে দেখানো হয় — তাদের মধ্যেও বোঝাপড়ার